সূরা কাহাফ

মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি

ফাহিমা খানম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১

‘সূরা কাহাফ’ নাজিলের সময় আরবের অবস্থা ১৪

◈ ইহুদি আলিমদের তিনটি প্রশ্ন ১৭

মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে কাফিরদের চ্যালেঞ্জ ১৯

ওহির গ্যাপ ও নবুয়তের প্রমাণ ২২

◈ প্রথমত, ওহির গ্যাপের মাধ্যমে এক আল্লাহ ও নবুয়তের প্রমাণ ২৩
◈ দ্বিতীয়ত, এক মহান রবের চাওয়া ব্যতীত কিছুই ঘটা সম্ভব নয় ২৪
◈ তৃতীয়ত, পূর্ববর্তীগণও ‘ইনশাআল্লাহ’-এর অনুসারী ছিলেন ২৭
◈ ‘ইনশাআল্লাহ’ বলার শিক্ষা ৩০

কাফিরদের চ্যালেঞ্জের জবাব ৩১

◈ হাদিসের আলোকে আল কাহাফের মর্যাদা ৩৩

সূরা কাহাফে উল্লিখিত চারটি গল্প ও মানবজীবনের বাস্তবতা

‘আসহাবে কাহাফ’-এর ঈমানি পরীক্ষা ৩৭

◈ আসহাবুল কাহাফের গুহা, শহর, সংখ্যা ও সময় নিয়ে মতভেদ ৪৮
◈ ঈমানের পরীক্ষা ও মানবসমাজের বাস্তবতা ৫২
- শিরক এ ভরা মানবসমাজ ৫২
- হালাল-হারামের সাথে অবস্থান ৫৮
- ত্যাগ ও হিজরতের মানসিকতার অভাব ৬৪
- অহেতুক বিষয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ৬৬
- দুআয় অভ্যস্ত না হওয়া ৬৮

অহংকারী প্রতিবেশী ও মুমিন বন্ধু ৭১

◈ ধনসম্পদ ও জনবলের পরীক্ষা এবং মানবসমাজের বাস্তবতা ৭৬
- সম্পদের মোহে মা-বাবার সাথে অসদাচরণ ৭৯
- প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনকে অবজ্ঞা ৮১

- প্রভাব-প্রতিপত্তির দম্ভ ৮৩
- সন্তান নিয়ে গর্ব-অহংকার ৮৫
- রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছায় অপচয়-অপব্যয় ৮৬
- রূপ, সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যের অহংকার ৮৯

মুসা ও খিজির (আ.)-এর সফর : জ্ঞানের পরীক্ষা ৯১

◈ খিজির (আ.) থেকে মুসা (আ.)-এর জ্ঞানাহরণ ৯৫
- জ্ঞানী হয়েও জ্ঞানাহরণের আকাঙ্ক্ষা ৯৬
- শিক্ষকের প্রতি বিনয়াবনত হওয়া ৯৭
- জ্ঞানী হয়েও নিজেকে ক্ষুদ্রজ্ঞান করা ৯৮

◈ নবি মুসা আর খিজির (আ.)-এর সাক্ষাতের স্থান ও মতভেদ ৯৯
- এককথায় মুসা ও খিজির (আ.)-এর পরিচয় ১০২

◈ জ্ঞানের পরীক্ষা এবং মানবসমাজের বাস্তবতা ১০৩
- নিজেকে সর্বজ্ঞানী ভাবা ১০৩
- স্বপ্রতিষ্ঠান নিয়ে উদ্যতা ১০৬
- জ্ঞানার্জনে ভ্রমণ ও তার অপব্যবহার ১০৮
- শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক ১১১

বাদশাহ জুলকারনাইনের পূর্ব-পশ্চিমে ভ্রমণ : ক্ষমতার পরীক্ষা ১১৪

◈ জুলকারনাইনের পরিচয় ও ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন ১১৯
- একনজরে ঈমানদার বাদশাহ জুলকারনাইনের পরিচয় ১২৩

◈ ক্ষমতার পরীক্ষা ও মানবসমাজের বাস্তবতা ১২৩
- শিরকের সাথে আপস ১২৪
- পজিশনের দাপট ও ক্ষমতার অপব্যবহার ১২৬
- সম্পদ লাভের প্রতিযোগিতা ১২৮
- শোকরগুজারি না হওয়া ১২৯
- ক্ষমতার দম্ভে প্রভুসুলভ আচরণ ১৩১

পূর্ণতার পথে ১৩৩

ভূমিকা

দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠ কিতাব আল কুরআন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। সরাসরি মহান রবের পক্ষ থেকেই এসেছে এই নির্দেশনাগ্রন্থ। এ বিষয়ে মহান রব নিজেই আল কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন—

'এটি সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর মুত্তাকিদের জন্য তা পথপ্রদর্শক।'[১]

আল কুরআন হলো মানবজাতির জন্য একটি মুজিজা (Miracle)। এ গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ, আয়াত ও সূরা মানবজাতির জন্য জ্ঞানাহরণ, শিক্ষা, পথনির্দেশনা ও ইন্সপাইরেশনে ভরপুর। কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ১৮ নং সূরা 'আল কাহাফ'। এটি এমন এক সূরা, যেখানে বিভিন্ন উপদেশাবলির সাথে মূলত পূর্ববর্তীদের চারটা ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে মানবজাতির পথচলার জন্য।

এই ঘটনাগুলোর প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কোনো না কোনো সমস্যা বা পরীক্ষার সাথে মিলে যায়। জীবন চলার পথে এ সমস্যা বা পরীক্ষা কেবল নির্দিষ্ট ধর্ম ও বর্ণের নয়; তা বরং পুরো মানবজাতির মধ্যে যে কারও হতে পারে—হোক সে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান কিংবা অন্য যেকোনো ধর্মের অনুসারী। তাইতো এ কুরআন সবার জন্য দিকনির্দেশনা। এটাই বলা হয়েছে সেই কিতাবে। যেমন :

'এটা মানুষের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা। আর আল্লাহভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শন ও উপদেশ।'[২]

এজন্যই শ্রেষ্ঠ মানব রাসূল (সা.) মুসলমানদের পবিত্র দিন প্রতি জুমাবারে 'আল কাহাফ'[৩] পড়তে উৎসাহিত করেছেন। এর পেছনেও রয়েছে বিশাল হেকমত (Strategy), যা সাধারণভাবে বোঝা কঠিন। তারপরও ক্ষুদ্র জ্ঞান থেকে কিছুটা হলেও বোঝা যায়—কেন 'আল কাহাফ' এভাবে বারবার পড়তে বলা হয়েছে। কারণ, প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিনিয়ত নানাবিধ পরীক্ষার সম্মুখীন; হোক তা ছোটো কিংবা বড়ো।

পরীক্ষা যা-ই হোক না কেন, প্রতিটি মানুষের কাছে তার নিজ পরীক্ষাটা অনেক কঠিন। কারও কাছে যেটা সামান্য ব্যাপার, অন্যের কাছে তা হয়তো বড়ো সমস্যা। কেউবা আবার ছোটো কিংবা তুচ্ছ বিষয়ে ডিপ্রেস্ড (Dipressed) হয়ে বড়ো বড়ো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। মূলত, বেশির

---

[১] সূরা বাকারা : ২

[২] আলে ইমরান : ১৩৮

[৩] সূরা আল কাহাফ

ভাগ মানুষের জন্যই নিজ সমস্যাটি যথাযথভাবে সমাধান করা কঠিন। এটাই বাস্তবতা। আবার অনেকে আছেন, রবের ওপর তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে বড়ো বড়ো সমস্যাগুলো উতরে যান।

একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে—দুনিয়ার জীবনে বিদ্যমান সকল মতানৈক্য, ঝগড়া, মারামারি, হানাহানি ও পরীক্ষার মূলে কিন্তু ওই বিষয়গুলোই চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই মহান রব নিজেই এভাবে মৌলিক পরীক্ষাগুলোকে একত্রিত করেছেন। অতঃপর পূর্বঘটিত চারটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে দিকনির্দেশনা (Guidelines) দিয়েছেন মানবজাতিকে।

এ ছাড়াও বিপদের মুহূর্তে মহান রবের সাহায্য চেয়ে পূর্ববর্তী ঈমানদারগণ কীভাবে দুআ করেছিলেন—তাও খুব সুন্দরভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে আল কাহাফে। একনজরে আল কাহাফের বড়ো চারটি ঘটনা দেখে নিই—

- 'আসহাবুল কাহাফ' গুহাবাসী যুবকদের ঈমানি পরীক্ষা।
- দুই প্রতিবেশী বন্ধুর সম্পদ ও সন্তানের পরীক্ষা।
- মুসা ও খিজির (আ.)-এর জ্ঞানের পরীক্ষা।
- ক্ষমতাসীন জুলকারনাইনের ক্ষমতার পরীক্ষা।

আল কাহাফে উল্লিখিত সত্য ঘটনাগুলো যথাক্রমে ঈমান, সম্পদ, সন্তান, জ্ঞান (নিজের জ্ঞানের যোগ্যতা-অযোগ্যতা) ও সমাজে নিজ পরিসরে প্রভাব-প্রতিপত্তির সাথে সম্পর্কিত। সাধারণত উল্লিখিত প্রতিটি বিষয় জীবন চলার পথে কোনো না কোনোভাবে এক বা একাধিক পরীক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মহান রবকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাধ্যমেই যে কারও জীবন পরিচালিত হয়। আবার সম্পদ ও সন্তান থাকলে তা পরীক্ষার অংশ। অথবা নিজের জ্ঞান ও যোগ্যতা কমবেশি যা-ই হোক, তাতেও নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তো সমাজের এক চিরন্তন পরীক্ষা, যা থেকে দূরে থাকা কোনোভাবেই সহজ নয়। তাই মহান রব জীবন চলার প্রতি পদে পদে তা সামাল দেওয়ার পদ্ধতি জানাতে এ সকল বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করেছেন। গল্পে গল্পে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এসবের মাধ্যমে।

এজন্যই একজন ব্যক্তি প্রতি জুমাবার 'আল কাহাফ' পড়বে। এর দ্বারা সে উপলব্ধি করতে পারবে নিজ সমস্যা। সপ্তাহে অন্তত একদিন অর্থ অনুধাবন করে সূরাটি পড়লে যে কেউ তা সহজেই বুঝতে পারবে। এভাবেই সবরের সাথে সমস্যাগুলো মোকাবিলা করার উপায় জানবে, ইনশাআল্লাহ। এটা তাকে পরিচালিত হতে সয়াহতা করবে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে। আবার পরবর্তী সপ্তাহে তা পুনরায় রিমাইন্ড করবে। এভাবে প্রতিনিয়ত ব্যক্তির জীবনে ওতপ্রোতভাবে সঙ্গী হয়ে যাবে 'আল কাহাফ'। প্রশান্তচিত্ত মুমিন হতে সাহায্য করতে থাকবে তাকে...

উল্লিখিত বাস্তবতাকে সামনে রেখে জীবনে প্রবহমান খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইসব সত্য গল্প নিয়ে আমরা সামনে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আছে মূলগল্প, গল্পের শিক্ষা আর সেসবের আলোকে বর্তমান মানবসমাজের বাস্তব চিত্র। একই সঙ্গে আমাদের করণীয়ও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যেন একজন প্রকৃত জ্ঞানী জীবনের বাঁকে নিজ পরীক্ষাটা কোন পর্যায়ের তা নির্ণয় করতে পারেন। সবর ও সমাধানের চেষ্টা করতে পারেন তার আলোকে।

এই ঘটনাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আল্লাহ বিভিন্ন আয়াতে এ কিতাবের সত্যতা তুলে ধরেছেন। দিয়েছেন নিজের একত্ববাদের ঘোষণা। ঈমানদারদের পুরস্কার ও জাহান্নামিদের অবস্থাসহ অন্যান্য বিষয়ও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাই বলা যায়, 'আল কাহাফ' হলো বিস্মৃতি থেকে রক্ষা পাওয়া, আত্মপরিচালন নির্দেশনা ও উৎসাহ লাভের অন্যতম মাধ্যম।

‘সূরা কাহাফ’ নাজিলের সময় আরবের অবস্থা

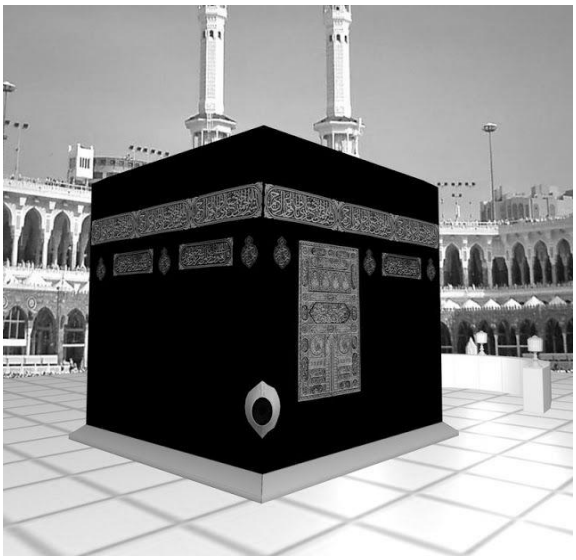

মহান রব্বুল আলামিন সমগ্র কুরআনের আয়াত ও সূরাগুলো কোনো না কোনো অবস্থা, ঘটনা, প্রেক্ষাপট কিংবা নির্দেশনার আলোকে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে পাঠিয়েছেন। রাসূল (সা.)-ও নবুয়তপ্রাপ্তির পরে নিজ পরিবার, নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের মাঝে দাওয়াত দিতে থাকলেন এক ইলাহের প্রতি ঈমান আনার জন্য। আর চুপিসারে ইসলাম গ্রহণ করে হিদায়াতের পথে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করছিলেন তাদের অনেকে।

মক্কায় প্রাথমিক দাওয়াতের কাজে কয়েকটি অবস্থানের কথা কুরআন, হাদিস ও তাফসিরগুলো থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়। আরও জানা যায় কুরাইশসহ আরবদের তৎকালীন সার্বিক সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা। মক্কার কুরাইশরা ছিল বহু মূর্তিপূজায় লিপ্ত। নিজের মানমর্যাদাকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে তারা পছন্দ করত।

একই সাথে ছিল খুবই অহংকারী। নিম্নশ্রেণিভুক্তদের সাথে বসতেই চাইত না। বংশমর্যাদার অহংকার, সম্পদ, ক্ষমতা ও সম্মানের দম্ভ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এ ছাড়াও ছিল বহু খোদায় বিশ্বাসী।

আবার ইহুদি ও নাসারাদের (খ্রিষ্টান) অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই এক রবে বিশ্বাসী ছিল। তাদের অধিকাংশ বিশ্বাস করত, মহান রবের সন্তান রয়েছে কিংবা একাধিক রব রয়েছে। এককথায় তারাও ছিল মুশরিক ও বহু মূর্তির পূজারি।

কালের পরিবর্তনে বর্তমানেও মানবজাতির অনেকের মাঝে এক ইলাহকে ভুলে গিয়ে শিরক ও বিদআতি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। সম্পদের লোভে অন্যায়-অনাচার, অহংকার, ক্ষমতার মোহ ও জ্ঞানের গর্ব প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। এক রবের ওপর বিশ্বাস থাকার পরও বিশ্বাসের দুর্বলতা ও ক্ষমতার লোভের কারণে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তরে বিশ্বাসীদের ওপর চলছে অহরহ নির্যাতন।

এমন পরিস্থিতি রাসূল (সা.)-এর নবুয়তপূর্ব সমাজব্যবস্থার সাথে বহুলাংশে সাদৃশ্যপূর্ণ। কলুষিত সে সমাজের পরিবর্তনের লক্ষ্যে সমগ্র মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন মুহাম্মাদ (সা.)। নবুয়ত পেয়েই তিনি এক মহান রবের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। কিন্তু মক্কার মুশরিকরা কোনোভাবেই তা মেনে নিতে পারছিল না। বিশেষত, যারা মক্কার গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় ছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন রাসূল (সা.)-এর রক্তসম্পর্কীয় ও বংশীয় আত্মীয়।

এ দাওয়াতকে প্রথমে ততটা আমলে নেয়নি তারা। কারণ, ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভালোবাসা থাকায় তাঁর বিরোধিতা করার কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু ক্রমান্বয়ে দেখল—মুহাম্মাদ (সা.)-এর নতুন ধর্মের প্রচার ও প্রসার বেড়ে চলছে। অনেকেই দলে দলে চুপিসারে দাখিল হচ্ছে পরিপূর্ণ ধর্ম ইসলামে। এ অবস্থা দেখে কুরাইশ নেতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সতর্ক হয়ে উঠল। বিভিন্নভাবে দাওয়াত বন্ধ করার তাগাদা দিতে থাকল মুহাম্মাদ (সা.)-কে। তবে সেই স্বপ্ন বাস্তবতার মুখ দেখেনি। তা কেবল তাদের চিন্তার জগৎকেই রঙিন করে তুলেছিল।

একদিন কুরাইশ নেতা উতবা ইবনে রাবিয়া কাবার ভেতর রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বলল—'ভাতিজা তুমি কী চাও বলো তো। যা চাইবে, তা-ই এনে দেবো। তবুও এই নতুন ধর্ম প্রচার বন্ধ করো।' ঠিক তখন সূরা 'হা-মিম আস-সিজদা' নাজিল হলো। উতবার সামনেই সূরাটি তিলাওয়াত করলেন মুহাম্মাদ (সা.)। আর সিজদার আয়াত আসায় সিজদায় অবনত হয়ে পড়লেন।[৪] সিজদা থেকে উঠে উতবাকে বললেন—'হে চাচা! আপনি যা শোনার শুনলেন। এখন যা ইচ্ছা করতে পারেন। আমি ভয় পাচ্ছি, না জানি আপনাদের ওপর কোনো বিপদ নাজিল হয়।' তখন উতবা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সেখান থেকে চলে যায়।

[৪] আল হাদিস : মারেফুল কুরআন, পৃ. ১১৯৮

আরও একবার একইভাবে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি প্রভৃতি প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া হয় তাঁকে। তখন কুরাইশ নেতাদের তিনি বলেছিলেন—'আপানারা যদি আমাকে মক্কার সবচেয়ে সুন্দরী নারীও এনে দেন, তবুও কখনো মহান রবের একত্ববাদের দাওয়াত প্রচার থেকে বিরত হব না। এমনকি এক হাতে চন্দ্র আর অন্য হাতে সূর্য এনে দিলেও না।'

এরপর কুরাইশ নেতারা চিন্তিত হয়ে পড়ল—কী করা যায় মুহাম্মাদের নতুন ধর্ম ইসলামকে নিয়ে। একপর্যায়ে নানা জনের মাধ্যমে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করাতে লাগল রাসূল (সা.)-কে। আর জুলুম-অত্যাচার শুরু করল নওমুসলিমদের ওপর। তাফসিরে এসেছে, মক্কিযুগের তৃতীয় অধ্যায়ে এ সূরাটি নাজিল হয়। প্রতিটি অধ্যায় ছিল :

প্রথমত, এক আল্লাহকে অস্বীকার।

দ্বিতীয়ত, জুলুম-নির্যাতন।

তৃতীয়ত, জুলুম-নির্যাতনের মুখে কিছু সাহাবিদের আবিসিনিয়ায় হিজরত ও নবুয়তের প্রমাণ।

চতুর্থত, মদিনায় নবিজির হিজরত।

দেখা যায়, মক্কার প্রথম যুগের তৃতীয় অবস্থানে আল্লাহর একত্ববাদ ও নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ সূরা 'আল কাহাফ' নাজিল হয়। ইতোমধ্যেই তৃতীয় অবস্থায় কুরাইশ নেতারা ভাবল—অত্যাচার নির্যাতন করে তো নতুনদের থামানো যাচ্ছে না! এবার কি কিছু একটা করা দরকার? কোনোভাবেই কি মুহাম্মাদের নতুন দাওয়াত বন্ধ করা যাবে না? অতঃপর নেতৃস্থানীয়দের নিয়ে সলাপরামর্শ করতে বসল তারা।

আলোচনা শেষে পরামর্শ এলো—তারা ইহুদি আলিমদের কাছে জানতে চাইবে, মুহাম্মাদ সত্য নবি কি না? অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে কি সত্যিই এক রবের ওহি আসে? রাসূল হিসেবে তিনিই কি মনোনীত হয়েছেন? কেননা, সকলের কাছে স্বীকৃত ছিল, ইহুদিদের কাছে পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের জ্ঞান রয়েছে। ওই গ্রন্থে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা ছিল—আহমাদ নামে একজন রাসূল আসবেন সমগ্র দুনিয়ার জন্য। সেই নির্বাচিত ব্যক্তিই হবেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবি।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন—'কুরাইশ নেতাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের মধ্য হতে দুজন লোক নিযুক্ত করা হয়। তারা হলো নাজার ইবনে হারিস ও উকবা ইবনে মুইত। নেতাদের সর্বসম্মতিক্রমে ওই দুজনকে পাঠানো হয় মদিনার ইহুদি আলিমদের কাছে।'

ইহুদি আলিমদের তিনটি প্রশ্ন

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তিকালে মদিনায় অনেক ইহুদিদের বসবাস ছিল। কুরাইশ মুশরিকরাও জানত—ওখানে এমন কয়েকজন ইহুদি আলিম বসবাস করে, যারা আসমানি

কিতাবের জ্ঞানে সমৃদ্ধ। অতঃপর ওই দুই ব্যক্তি ইহুদি আলিমদের পরামর্শ লাভের আশায় মদিনায় পৌঁছায় এবং বিস্তারিত খুলে বলে মক্কার অবস্থা।

ইহুদি আলিমরা সব শোনে। বিলম্ব না করেই বসে যায় শেষ রাসূলের নবুয়তের আলামত নিয়ে। তারা আরও কিছু প্রশ্ন করে মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারীদের ব্যাপারে। কথিত আছে, ইহুদিরা খুব সূক্ষ্ম জ্ঞানবুদ্ধি ও কূটকৌশলের অধিকারী। তাই সব শুনে তারা বুদ্ধি পাকাল—কী করে মুহাম্মাদ নবি কি না প্রমাণ করা যায়।

অতঃপর আলিমদের মাথায় চিন্তা এলো, আরবে কিছু প্রচলিত ঘটনা আছে—যা সম্পর্কে তাদের বিস্তারিত ধারণা নেই। কেননা, তৎকালীন আরবে অনেক কল্পকাহিনি লোকমুখে প্রচলিত ছিল; কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। সে রকম কিছু কাহিনির মধ্যে ছিল শত শত বছর আগে হারিয়ে যাওয়া গুহাবাসী যুবকদের ঘটনা। আরও ছিল সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে মুসা (আ.)-এর সাক্ষাৎ আর একজন বাদশার সাথে ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনাসহ লোকমুখে প্রচলিত অনেক বিচ্ছিন্ন কথা। এসবের সঠিক ভিত্তি ও ঘটনা কারও জানা ছিল না। তাই তারা চিন্তা করল—মুহাম্মাদ সাধারণ মানুষ হলে এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারবে না। আর সত্যিই নবি ও রাসূল হয়ে থাকলে ওহির মাধ্যেম তা জানাতে পারবে।

এই চিন্তাকে সামনে রেখে এক ঢিলে দুই পাখি মারার চিন্তা করল তারা। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল—ঘটনাগুলোর প্রকৃত রহস্য উন্মোচন ও এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুয়তের সত্যতা যাচাই করা। আলোচনার সিদ্ধান্তানুযায়ী ইহুদি আলিমগণ মুহাম্মাদ (সা.) সত্য রাসূল কি না, তার অনুসন্ধানে নিজেদের ওই প্রচলিত কাহিনির আলোকে কিছু প্রশ্ন তৈরি করে দিলো। তারা বলল—'যাও, মুহাম্মাদকে এ তিনটি প্রশ্ন করো। এগুলোর উত্তর দিতে পারলে তিনি সত্য রাসূল। আর না পারলে বুঝে নেবে—এই ব্যক্তি সত্য রাসূল নন।'

এরপর কুরাইশদের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরা মদিনার ইহুদি আলিমদের সাথে সাক্ষাৎ শেষে মক্কায় ফিরে এলো। আর আলিমদের সাথে সাক্ষাতের সাফল্যের কথা ও প্রশ্নগুলো বিস্তারিত নেতাদের জানালে তারা যারপরনাই আনন্দিত হয়।

কুরাইশ দূতদের কাছে যে সকল প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিল—

১. মুহাম্মাদ (সা.)-কে ওইসব যুবকের ব্যাপারে প্রশ্ন করো, যারা শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল?

২. তাঁকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করো, এটা কী?

৩. সে ব্যক্তির ঘটনা কী, যিনি পূর্ব ও পশ্চিম ভ্রমণ করেছিলেন?

মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে কাফিরদের চ্যালেঞ্জ

মদিনার আলিমদের থেকে প্রশ্নগুলো পেয়ে কুরাইশ নেতারা মহাখুশি। তারা ভাবতে লাগল—এবার মুহাম্মাদকে খুব ভালোভাবে জব্দ করতে পারবে। নবুয়তের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে এর মাধ্যমে।

তারা দ্রুত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে গেল। আর বলল—'হে মুহাম্মাদ! তুমি সত্য রাসূল হয়ে থাকলে আমাদের প্রশ্ন তিনটির সঠিক জবাব দাও। এর দ্বারা আমরা বুঝে নেব—তুমি সত্যিই রাসূল, না আমাদের মতো সাধারণ মানুষ।'

মুহাম্মাদ (সা.) সবকিছুর জবাব পেতেন ওহির মাধ্যমে। কোনো প্রশ্ন বা সমস্যার সম্মুখীন হলে মহান রব্বুল আলামিন ওহি নাজিল বা ইলহামের মাধ্যমে তার সমাধান জানিয়ে দিতেন। তাই রাসূল (সা.) প্রশ্নগুলো শুনলেন। আর পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বললেন—'ঠিক আছে, তোমরা আগামীকাল এসো। তোমাদের এ প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করব।' তিনি ভাবলেন—আগামীকালের আগে নিশ্চয়ই ওহির মাধ্যমে উত্তর এসে যাবে তাঁর প্রিয় রবের পক্ষ থেকে।

নবিজি মহান রবের পক্ষ থেকে ওহিপ্রাপ্তির আশায় অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু এক দিন অতিবাহিত হয়ে গেল, তবুও মহান রবের পক্ষ থেকে কোনো ওহি এলো না। পরের দিন এসে উত্তর না

পেয়ে হাসাহাসি করে চলে গেল কাফিররা। রাসূল (সা.) আরও সময় নিলেন তাদের থেকে। আবার চিন্তিতও হয়ে পড়লেন। এভাবেই পার হয়ে যায় তিন দিন। ওহি নাজিল হয়নি তখনও। ভীষণ চিন্তার ভাঁজ রাসূল (সা.)-এর কপালে! এক, দুই করে একইভাবে কটে গেল প্রায় পনেরো দিন। এরপরও ওহি আসার নাম নেই।

মুহাম্মাদ (সা.) একজন মানুষ ছাড়া কিছু নন। তিনি ছিলেন রবের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত রাসূল। মহান রব তাঁকে ওহির জ্ঞান না দিলে তাঁর পক্ষ থেকে গায়েবের খবর দেওয়া সম্ভব নয়। বিষয়টি তিনি ভালো করেই জানতেন। সাহাবিগণও জানতেন—তিনি সকলের মতোই একজন সাধারণ মানুষ। আল্লাহর রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নন! তাঁরাও এক রবের ওপর ভরসা করে রাসূলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। চিন্তিত হয়ে পড়লেন দেরি দেখে। এমনটা হবে নাই-বা কেন? তাঁরাও তো মানুষ। তবে আশাবাদী ছিলেন, মহান রব অবশ্যই তাঁদের মান-মর্যাদা সমুন্নত রাখবেন।

অন্যদিকে অবিশ্বাসী ও কাফিররা এই ভেবে খুশি হলো, মুহাম্মাদ বুঝি রিসালাতের মিথ্যা দাবি করে যাচ্ছে! সে মিথ্যা দাবিদার না হলে এতদিনেও জবাব দিচ্ছে না কেন? তারা প্রচার শুরু করতে লাগল—মুহাম্মাদ কীসের রাসূল? কেন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারছে না? সত্য রাসূল হলে তো অবশ্যই জবাব দিত।

ঠিক এরূপ অসহায় অবস্থা, দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার মধ্যে পনেরো দিনের মাথায় জিবরাইল (আ.)-এর আগমন ঘটে নবিজির কাছে। 'আল কাহাফ' নিয়েই অবতরণ করেন আল্লাহর এই বার্তাবাহক। সাথে ছিল আরও সত্তর হাজার ফেরেশতা! আল্লাহু আকবর! সম্মানিত ফেরেশতা ইহুদি আলিমদের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আসেন। আর রাসূল (সা.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—'হে রাসূল! আপনি বিচলিত হবেন না। আল্লাহ আপনাকে ছেড়ে যাননি।' সূরা আদ-দোহায় তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। যেমন :

'হে নবি! আল্লাহ আপনাকে ছেড়ে যাননি বা রাগও করেননি।'[৫]

আল কাহাফে ইহুদিদের চ্যালেঞ্জ করা প্রশ্নগুলো ছাড়াও মহান রব আরও কয়েকটা পূর্বের ঘটনা উল্লেখ করেন। এর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন— তোমাদের এ ক্ষুদ্র জ্ঞানের বাইরেও মহান রবের কাছে এরূপ বহু ঘটনা রয়েছে, যার ব্যাপারে ধারণাও নেই তোমাদের।

এভাবেই তৎকালীন কাফির, ইহুদি, নাসারা ও মুসলমানসহ সমগ্র মানবজাতির জন্য উত্তরগুলো আল কুরআনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অনন্তকালের জন্য তা আল্লাহর একত্ববাদের জবাব। একই সাথে গাইডলাইন হিসেবে মুমিনদের উৎসাহিত করে যাচ্ছে। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি পদে পদে বিভিন্ন ফিতনা কিংবা পরীক্ষার জবাবে তা সুস্পষ্টভাবে ইন্সপাইরেশন জোগাতে থাকবে। তাইতো বলা হয়—'নিশ্চয়ই এ কুরআন জ্ঞানীদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন।'

[৫] সূরা আদ-দোহা